সংখ্যালঘুর মানচিত্র
গীতা দাস
(৫)

সাম্প্রদায়িকতা আপেক্ষিক বলে সব সময় চিহ্নিত করা যায় না অথবা ভুলভাবে চিহ্নিত করা হয়। আবার সাম্প্রদায়িকতা নিজস্ব সম্প্রদায়ের কিছু রীতি নীতি ও আচারের মধ্যেও কি নিহিত থাকে! কখনও থাকে, কখনও থাকে না। আবার কোন সম্প্রদায়ের রীতি নীতি ও আচার অন্য সম্প্রদায়ের কাছে সাম্প্রদায়িক মনে হতেই পারে।

যেমন, আমার মা পঞ্জিকা মতে অর্থাৎ মায়ের মতানুসারে তিথি দেখে বাংলা নববর্ষ পালন করেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে কিছু নিয়ম কানুন মানেন।

এরশাদ সরকারের আমল থেকে বাংলাদেশের নববর্ষ ভারতের একদিন আগে হয়। আমাদের নাগরিক জীবনে বাংলাদেশের মত ও পথকেই অনুসরণ করি। অফিস ছুটি থাকে। বাংলা নববর্ষকে সংস্কৃতির অংশ মনে করি। বন্ধু-বান্ধবসহ, রক্তীয় না হলেও আত্মীয় পরিবেষ্টিত হয়ে নববর্ষ উপভোগ করি।

আমার মা আমাদের নববর্ষের দিন চৈত্র সংক্রান্তি পালন করেন। উনি আমাদের এ নিয়ে কোন চাপাচাপি করেন না। উনি এমনিতেই নিরামিষভোজী। সাথে বাড়তি একটু নিয়ম রীতি যোগ হয় মাত্র।

আমার মা কিন্তু ভারতীয় নববর্ষ করেন না। উনি তিথির নববর্ষ করেন ।

অথচ আমার এক প্রগতিশীল পরিচিত একবার মায়ের নববর্ষ পালন নিয়ে মন্তব্য করলেন ---- ‘‘ মাসিমার এ দেশে থেকে ভারতীয় রীতি অনুসরণ করা উচিত নয়।”

এ দেশের মুসলমানেরা আরবীয় সময়সূচিকে ভিত্তি করে ঈদ ও রোজা পালন করলেও একে আরবীয় না বলে চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল বলাই যুক্তিযুক্ত।

ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা এগিয়ে আনলেও নামাজের সময় কিন্তু ঘড়ির পরের কাঁটা ধরে পড়া হয় না। আক্ষরিক অর্থে ঘড়ির আগের কাঁটা ধরেও না। সময় ধরে নামাজ চলে। ফজরের আজান কয়টায় দেব না বলে বলা যায় ফজরের আজানের সময় কয়টা বাজে?

তেমনি আমার মায়ের নববর্ষও তাই। একজন নির্ভেজাল সত্তোরোর্ধ ধর্মপ্রাণ মহিলাকে নিয়ে এ মন্তব্য কোন পর্যায়ে পড়ে! নাকি আমার মায়েরই আরও উদার মনোভাব নিয়ে--- নিজের ধর্মীয় অনুভূতিকে ছাড় দিয়ে আমাদের সাথেই নববর্ষ পালন করা উচিত?

২০০২ সালে নারীপক্ষ (একটি নারী সংগঠন) থেকে ভাষাগত সংখ্যালঘু নারীদের সাথে মত বিনিময় সভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম। ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রত্যেকে তার মাতৃভাষা চর্চার অধিকার রাখে। অর্থাৎ এর মূলসুর বিশ্বব্যপী বিস্তৃত। কাজেইএ বিষয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অবস্থান জানার আগ্রহেই এ মত বিনিময় সভার আয়োজন।

দলটি ছিল উর্দু ভাষাভাষী নারী; যাদের বসবাস মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প। তাদের কথা শুনতে গিয়ে মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলছিলাম। কারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে গিয়ে অনেকেই উর্দু মিশ্রণে বাংলা বলছিল, কেউ কেউ বাংলা মিশ্রণে উর্দু বলছিল, আবার অনেকে ঝাড়া উর্দুতেই মতামত দিচ্ছিল --- যার মমার্থ আমি বুঝতে পারছিলাম না। মত বিনিময় সভার মাধ্যম কোন ভাষার হওয়া উচিত তা নিয়ে প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মানবাধিকারে বিশ্বাসী বলে যে আমি দাবী করি সেই আমিও মনে মনে বিরক্ত। সবশেষে নিজেকে সংযত করে সুস্থির হলাম। হঠাৎ মন একটু রেখাচ্যূত হয়েছিল যা পরমূহুর্তেই সামলে নিয়ে বিনীতভাবে বাংলা মিশিয়ে কথা বলতে অনুরোধ করলাম। যথারীতি সভা চললো।
তারা সভায় জানালো যে উর্দু লেখাপড়ার সুযোগ নেই। এখন পাকিস্তান বা ভারত থেকে আত্মীয় - স্বজনের চিঠি আসলে পড়ার জন্যে ক্যাম্পেই কাউকে খুঁজে নিতে হয়। আর নতুন প্রজন্ম মাতৃভাষা শেখার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে আত্মীয় - স্বজনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হারিয়ে ফেলবে। যদিও আমাদের সংবিধানের **গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ** বিষয়ের ৪৩ অনুচ্ছেদের (খ) তে বলা আছেঃ

‘‘ চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে।“

অন্যকে দিয়ে চিঠি পড়ালে যে গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অবশ্য এসব ভাষাগত সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকাররের বিষয়টিই অমীমাংসিত!

তাছাড়া, অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘু যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয় তাদেরও রাষ্ট্র মাতৃভাষা শেখার সুযোগ করে দিচ্ছে না। তারাও অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে বৈকি। ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় আমরা অনেকেই আপ্লুত ও গর্বিত। কিন্তু একটুও কি নিজেদের দেশের অবাঙালী গোষ্ঠির (ছোট ছোট জাতিগত গোষ্ঠিসহ) মাতৃভাষা চর্চার অধিকার এবং সুযোগ নিয়ে কখনো চিন্তা করেছি?

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন নারীর কথায় কোন উর্দ্দু রেশ নেই। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম তার বাপের বাড়ি ছিল নারায়ণগঞ্জে। গরীব বাবা পাকিস্তান আমলে এক বিহারী শ্রমিকের সাথে বিয়ে দিয়েছিল। তখনও বিষয়টি আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। তবে এ বিষয়ে ঐ মহিলাটির কোন ক্ষোভ নেই। গরীব বাবা যেভাবে পেরেছে একজন মুসলমানের সাথে বিয়ে দিয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশিও স্বাভাবিক কারণেই মেনে নেয়নি। মহিলাটি স্বামীকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জেই থাকতো।
স্বাধীনতার পর বাধ্য হয়ে জেনেভা ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিল। কারণ নারায়ণগঞ্জে স্বামীর জীবনের ঝুঁকি ছিল। পরে স্বামী মারা গেলেও আর বাপের বাড়ি ফিরে যেতে পারেনি। ইতোমধ্যে মা বাবা মারা গেছে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি বিহারীর বউ বলে তাকে নিজেদের লোক মনে করে না। ক্যাম্পেও তাকে বাঙালী বলে খোঁটা শুনতে হয়। ছেলেরাও আধা বাঙালী আধা বিহারী পরিচয়ে জীবন কাটাচ্ছে। মহিলাটি ভেজা কণ্ঠে জানতে চেয়েছিল--- 'আমার কী গুনাহ?'
মহিলাটির যাপিত জীবনের হাহাকারের উত্তরটা আমার জানা ছিল না। এখনও নেই। কারো জানা আছে কি?